লম্বকর্ণ : বৈঠকী বয়নশিল্প

মননকুমার মণ্ডল

'লম্বকর্ণ' গল্পটি গড্ডলিকা (১৩৩২) গল্পগ্রন্থের চতুর্থ গল্প। রায়বাহাদুর বংশলোচন ব্যানার্জ্জীর নিরুপদ্রব জীবনে একটি ছাগলের এসে পড়া এবং তাকে নিয়েই গল্পের কৌতুকাবহ পরিণতি। গল্পের শুরুতেই বংশলোচন বাবুর যে ছবিটা ফুটে ওঠে তাতে বৈঠকী মেজাজের চরিত্রগুলির নিদর্শন আছে। ঔপনিবেশিক শাসনে প্রভুশক্তির প্রদেয় উপাধি নিয়ে যারা যথেষ্ট প্রতিপত্তিসহ নগর কলকাতার আশেপাশে টিকে ছিলেন তাদের মধ্যে বংশলোচন ব্যানার্জ্জী অন্যতম। পুরো নাম রায় বংশলোচন ব্যানার্জ্জী বাহাদুর অ্যান্ড অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট, বয়সে চল্লিশোর্ধ, স্থূলকায় হবার ফলে ডাক্তারী পরামর্শে ভাত-লুচি বর্জ্জন করে প্রত্যহ বিকালে খালের ধারে হাঁটিতে বেরোন। রাজশেখরের গল্পে ইংরেজদের পোষা এরকম অনুগত দেশী চরিত্র অনেক আছে। সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডের তিনকড়ি বাবুর কথা মনে পড়ে। স্মরণে আসে তাঁর বহুখ্যাত উক্তি—'শেষে লিখলুম কোল্ডহ্যাম সাহেবকে, যে হুজুর তোমরা রাজার জাত, দু-ঘা দাও তাও সহ্য হয়, কিন্তু দিশী ব্যাঙাচির লাথি বরদাস্ত করব না।'—এটাই বংশোলোচনবাবু গোত্রের মানুষগুলির পরিচয়। কিন্তু 'লম্বকর্ণ' গল্পে স্ত্রী মানিনী দেবীর সাথে বংশলোচনবাবুর মনোমালিন্য কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে টেনে ধরেছে 'লম্বকর্ণের' কাহিনী। এই আপাত অপ্রধান জন্তুর কৌতুক গল্পে প্রায় মূলসুর হয়ে উঠেছে। বংশলোচনবাবুর মত মানুষগুলোর অন্তর্নিহিত শূন্যতা অথবা মানসিক দৈন্যতা প্রকাশের সহায়ক হিসাবে লম্বকর্ণের অস্তিত্বকে ধরা হলে—গল্পটি নিতান্তই কৌতুকের থাকে না। এরকম অলস, পরজীবি, প্রভুশক্তির অনুগত বয়ঃজ্যেষ্ঠ মানুষগুলো তো বাংলার নবজাগরণেরও মানুষ নয়। প্রভুত্বের চুঁইয়ে পড়া ক্ষমতার দম্ভে এঁরা বৈঠকী মজলিশি গল্পের প্রবহমানতাকে বজায় রেখেছিলেন। এদের আশেপাশে ঘিরে থাকে কিছু ক্ষমতালিপ্সু সময়-অপব্যায়ী মানুষ, যারা ঐ বৈঠকী মেজাজের অঙ্গীসুব। এরা সকলেই লম্বকর্ণকে নিয়ে ঘটনাগুলিকে Serious করে তোলে এবং seriousness-এর মায়াভেদে হাস্যরসের রকমফের ঘটে যায়। পরশুরামের গল্পে বাগভঙ্গির Seriousness একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণীর বর্ণনায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই গল্পে 'লম্বকর্ণ', 'চুকন্দর সিং', 'ভূশণ্ডীর মাঠ' গল্পে 'ক্ষীরী-বামনীর' অশরীরী চরিত্র এসবই এর উদাহরণ।

লম্বকর্ণ গল্পের কেন্দ্রে নিঃসন্দেহেই থাকে স্বামী স্ত্রীর দাম্পত্য কলহ। একথা কয়েকজন সমালোচকের লেখাতেও দেখা গিয়াছে। অভিভাবকহীন ছাগলের সাক্ষাৎ পেয়ে তাকে গৃহে প্রতিপালন করার জন্য নিয়ে আসার সময় বংশলোচনবাবুর 'মনে একটা কাঁটা খচ করিয়া উঠিল'। দাম্পত্য কলহের এই কাঁটার স্বরূপ হল—

'আজ পাঁচ দিন হইল কথা বন্ধ। ইহাদের দাম্পত্য কলহ বিনা আড়ম্বরে নিষ্পন্ন হয়। সামান্য একটা উপলক্ষ্য, দু চারটি নাতিতীক্ষ্ণ বাক্যবাণ, তারপর দিনকতক অহিংস অসহযোগ, বাক্যালাপ বন্ধ, পরিশেষে হঠাৎ একদিন সন্ধিস্থাপন ও পুনর্মিলন। এরকম প্রায়ই হয় বিশেষ উদ্বেগের কারণ নাই। কিন্তু আপাতত অবস্থাটি সুবিধাজনক নয়। গৃহিণী জন্তু জানোয়ার মোটেই পছন্দ করেন না।"

· এরকম একটি দাম্পত্য সম্পর্ক কিভাবে মিলনমধুরতার বৃত্ত সম্পূর্ণ করল, তার গল্প লম্বকর্ণ। গৃহকর্ত্রী মানিনী দেবীর সঙ্গে বংশলোচনবাবুর মান-অভিমান ছাগল লম্বকর্ণকে নিয়েই বেড়ে উঠল। 'ভদ্দর লোকে আবার ছাগল পোষে।' একথা বলে মানিনীদেবী দারোয়ান চুকন্দর সিংকে বলেন তাকে বের করে দিতে। কিন্তু বংশলোচনবাবু আত্মসম্মান আছে। তিনি বেলেঘাটার সম্ভ্রান্ত অনারারি হাকিম—পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা একমাস জেলের শাস্তিবিধান তাঁর হতে। ফলতঃ 'কিসের লজ্জা, কিসের নারভাসনেস? বংশলোচন বার কয়েক মনকে প্রবোধ দিলেন—তিনি কাহারও তোয়াক্কা করেন না।' দারোয়ানকে তিনি বলে দিলেন ছাগল বাড়ির বাইরে গেলে চাকরিও যাবে তার। এই অবস্থায় পুরাকালে জাঁদরেল জেদী পুরনারীরা যা করতেন মানিনী দেবীও তাই করার কথা বলেন। "মানিনী স্বামীর প্রতি অগ্নিময় নয়নবান হানিয়া বলিলেন—'হ্যাঁলা টেঁপী হতচ্ছাড়ী, রাত্তির হয়ে গেল—গিলতে হবে না? থাকিস তুই ছাগল নিয়ে, কাল যাচ্ছি আমি হাটখোলায়।' হাটখোলায় গৃহিণীর পিত্রালয়।" এহেন মান-অভিমানের ফলশ্রুতিতে বৈঠকখানা ঘরে শোবার বিছানা করেন কর্তা অন্যদিকে কর্ত্রী পিত্রালয়ে। এখানে এই পারস্পরিক শয়নস্থান পরিবর্তনকে অপূর্ব ব্যঙ্গরসে জারিত করেছেন পরশুরাম। পুরাকালে বড়লোকদের গৃহে আর্যনারীদের একটি করে গোসাঘর থাকত। কিন্তু আর্যপুত্রদের তেমন ব্যবস্থার কথা শোনা যায় না। তারা এক পত্নীর সাথে মতান্তরে অন্য পত্নীর দারস্থ হতেন। কিন্তু, 'আজকাল খরচপত্র বাড়িয়া যাওয়ায় এই সকল সুন্দর প্রাচীন প্রথা লোপ পাইয়াছে। এখন মেয়েদের ব্যবস্থা শুইবার ঘরের মেঝের উপর মাদুর অথবা তেমন হইলে বাপের বাড়ি। আর ভদ্রলোকের একমাত্র আশ্রয় বৈঠকখানা।" এরকম বর্ণনার humour-এ যে বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিতুলনা পাওয়া যায় তা অসাধারণ। রাত্রে আহারের পর বৈঠকখানা ঘরে একাকী বংশলোচনবাবুর গীতাপাঠ এবং সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি প্রয়াসেও সেই হাস্যরসের বিদ্যুৎছটা।

রাত্রে লম্বকর্ণ বংশলোচনবাবুর বিছানায় শয্যাগ্রহণের ঘটনা যেমন কৌতূহলদ্দীপক তেমনি কৌতুকাবহ। কিন্তু এখান থেকেই বংশলোচনবাবুর অপদস্থ হবার সূত্রপাত। এই অপদস্থতার সূত্রেই তিনি লাটুবাবুর কাছে লম্বকর্ণকে দিতে উদ্যোগী হন। শর্ত এই যে—'ছাগলটিকে আপনি যত্ন করে মানুষ করবেন, বেচতে পারবেন না, মারতে পারবেন না।' যাইহোক, 'ভদ্দরলোক কখনও ছাগল পোষে?' এই প্রশ্ন করেও লাটুবাবু লম্বকর্ণকে নিয়ে গেল। তারপর লাটুবাবুর ব্যান্ডের দলের সমস্ত সামগ্রী যখন একে একে গলাধঃকরণ করল সে তখন তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এল লাটুবাবু। 'লব্বইটাকার লোট্' খেয়ে ফেলার শোকে মুহ্যমান লাটুবাবুকে বংশলোচনবাবুর পরামর্শ—'একটা জোলাপ দিলে হত না?'। এই মন্তব্যগুলির একটা আপাত Seriousness-ই হাস্যরসের আধার। বিধ্বস্ত লাটুবাবু ও তার কেরাসিন ব্যান্ডের ইতিহাসও কৌতুকাবহ। যাইহোক একশ' টাকা ক্ষতিপূরণ নিয়ে লাটুবাবুর দল বিদায় নিলে লম্বকর্ণকে নিয়ে পুনরায় বিড়ম্বনা শুরু হল বংশবাবুর। বিনোদবাবুর সামনে টেঁপী বাবা-মায়ের ঝগড়ার কথা ফাঁস করে দিতে থাকলে বংশলোচন বলেছেন—'আরে এতদিন সব মিটে যেত, ওই ছাগলটাই মুশকিল বাধালে।' অর্থাৎ লম্বকর্ণ আর এখন অদ্ভুত আচরণকারী চতুষ্পদী ছাগলমাত্র নয়। সে মানুষের পরিবারে সমস্যা উদ্রেককারী আরেকটি মনুষ্যচরিত্রর

মত ভূমিকা তার। পরদিন বেলেঘাটা খালের ধারে লম্বকর্ণকে ছেড়ে আসার সময় প্রবল বজ্রপাত এবং দুর্যোগে বংশলোচনবাবু জ্ঞান হারালেন। আর একবার তার দুর্বলচিত্ত মনের প্রকাশ ঘটল। কিন্তু ছাগল লম্বকর্ণ বৃষ্টি ধরতেই বাড়িতে খবর দিলেন এবং গৃহকর্ত্রী ফিরে পেলেন কর্তাকে। ভুলে গেলেন অভিমান। সাদর আপ্যায়নে বাড়িতে রয়ে গেল লম্বকর্ণ। লোকজনের বিদ্রুপে তো লম্বকর্ণের কোনকালেই কিছু আসে যায় না। পরাশ্রয়ী জীব এমন আশ্রয়েই ভাল থাকে। বাবু সম্প্রদায়ের এই মজলিশি মানুষগুলো বিশ শতকের প্রথমার্ধের যুদ্ধকালীন ক্ষয়িষ্ণুতার স্মারক হয়ে আছেন। পরশুরামই সম্ভবত একমাত্র শিল্পী যার কলমে এঁদের মন-মানসিকতার অন্যতর নির্মাণ ঘটেছিল।

সামগ্রিকভাবে গল্পটিতে হাস্যরসের প্রবাহ চারটি বিভিন্ন মাত্রায় হয়েছে। প্রথমতঃ নানা চরিত্রের উপস্থাপনায়—তাদের বর্ণনার সূক্ষ্মরীতিতে। দ্বিতীয়তঃ বংশলোচনবাবুর বাড়ির সান্ধ্য আড্ডার বিষয় এবং কথোপকথনে। তৃতীয়তঃ বংশলোচনবাবুর নানা পর্যায়ে অপদস্থ হওয়া এবং তাঁর বিড়ম্বনায়। চতুর্থতঃ লম্বকর্ণের বিচিত্র কার্যকলাপ। গল্পে এগুলির উদাহরণ সুপ্রচুর। যেমন, দারোয়ান চুকন্দর সিং-এর পরিচয়—"'হজৌর' বলিয়া হাঁক দিয়া চুকন্দর সিং হাজির হইল। জীর্ণ খর্বাকৃতি বৃদ্ধ, গালপাট্টা দাড়ি, পাকানো গোঁফ, জাঁকালো গলা এবং ততোধিক জাঁকালো নাম—ইহারই জোরে সে চোট্টা এবং ডাকুর আক্রমণ হইতে দেউড়ি রক্ষা করে।"

আবার লাটুবাবুর দল যখন এসেছে তাদের বর্ণনা এরকম—"তিনজন সহচরের সহিত লাটুবাবু বাবান্দায় আসিয়া নমস্কার করিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের বেশভূষা প্রায় একই প্রকার—ঘাড়ের চুল আমূল ছাঁটা। মাথার উপর পর্বতাকার তেড়ি, রগের কাছে দু-গোছা চুল ফণা ধরিয়া আছে। হাতে রিস্ট -ওয়াচ, গায়ে আঙুলফলম্বিত পাতলা পাঞ্জাবি, তার ভিতর দিয়া গোলাপী আভা দেখা যাইতেছে। পায়ে লপেটা, কানে অর্ধদগ্ধ সিগারেট।" আর তারপর লাটুবাবু একে একে তার কনসার্ট দলের সঙ্গী সাথীদের আলাপ করিয়ে দিতে বলেন—

> 'নবীন নিয়োগী ক্লারিয়নেট—এই নরহরি নাগ ফ্লুলোট—এই নবকুমার নান্দন ব্যায়লা।'

এসব বর্ণনায় আবহটাই হয়ে ওঠে বৈঠকী মেজাজের, হাস্যরসের। বর্ণনায় একটা কার্টুনিস্টের মত ঝোঁক। তুচ্ছাতিতুচ্ছ বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যবেক্ষণ করার শক্তি না থাকলে বর্ণনার ভাষায় এই Wit সঞ্চারিত করা যায় না। বংশলোচনবাবুর বাড়ির সান্ধ্য আড্ডার পরিবেশে ও আড্ডার বিষয় ত্রৈলোক্যনাথের গল্প-আসরের কথা স্মরণে আনে। বংশলোচনবাবুর সুসজ্জিত বড় ঘরের কার্পেটে আঁকা আছে কাল জমির ওপর আসমানী রঙের বিড়াল। বিড়াল বোঝানোর জন্য নিচে লেখা আছে CAT এবং রচয়িত্রীর নাম মানিনী দেবী। বিড়ালের রঙ সাদা না হয়ে আসমানী হবার কারণ জানান হয়েছে—"যুদ্ধের সময় বাজারে সাদা পশম ছিল না, সুতরাং বিড়ালটির এই দশা হইয়াছে।" আড্ডাখানার ঘরে একটি রাধাকৃষ্ণের ছবির বর্ণনাও চমৎকার। "কৃষ্ণ রাধাকে লইয়া কদমতলায় দাঁড়াইয়া আছেন, একটি প্রকাণ্ড সাপ তাঁহাদিগকে পাক দিয়া পিষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু রাধাকৃষ্ণের ভ্রূক্ষেপ নাই; কারণ সাপটি বাস্তবিক সাপ নয়, ওঁকার মাত্র।"

এরকম বর্ণনাত্মক বিষয়ের মধ্যেই লুকিয়ে আছে হাস্যরসের খোরাক। এই বৈঠকখানায় প্রতিদিন বহুসংখ্যক 'রাজা-উজির বধ হইয়া থাকে'। পরমার্থতত্ত্ব, মোহনবাগান, আলিপুরের নতুন কুমির কোন প্রসঙ্গই বাদ যায় না। বংশলোচনের শ্যালক নগেন এবং দূরসম্পর্কের ভাগনে উদো'র (উদয়) বাগ-বিতণ্ডা প্রবল হাসির খোরাক। বাঘের মাপ সংক্রান্ত বিতর্কে তারা প্রায় মারামারির উপক্রম করেছে। পত্নীনিষ্ঠ উদোর কথায় কথায় নিজের স্ত্রীর প্রসঙ্গ টেনে আনার বদভ্যাস সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। এরকম বৈঠকখানায় গল্প-আমেজের ছাপ এই গল্পের সর্বত্র। এমন মনে হয় যে, বৈঠকখানার সমস্ত মানুষগুলোই এরকম অদ্ভুত বিড়ম্বনার গল্পের চরিত্র। বৈঠকী মেজাজের মধ্যে যে স্বাভাবিক হাস্যরস এবং সিরিয়াসনেস পাশাপাশি চলে এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। লম্বকর্ণকে টেনে বাড়িতে আনার পর সে সিরিয়াস হয়ে ওঠে। তখন ছাগলের স্বাভাবিক আচরণ মানুষের স্বাভাবিক দৈনন্দিতার মধ্যে নিয়ে আসে বিড়ম্বনা, তৈরী হয় নির্মল হাসির পরিবেশ। ত্রৈলোক্যনাথের বৈঠকী মেজাজের সঙ্গে এই গল্পের তুলনামূলক আলোচনায় সমালোচক শিশিরকুমার দাশ বিষয়টি ধরছেন সুন্দর ভাবে। উদ্ধার করি কিছু অংশ—'এই দুটি গল্পেই ('লম্বকর্ণ' এবং 'চিকিৎসা সঙ্কট') একটি আসর লক্ষ্য করা যায় এবং আসরের কথাবার্তা ও চরিত্রগুলির হাবভাবের মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথের আসরের ভঙ্গি অতি স্পষ্ট। ত্রৈলোক্যনাথ আসরেব প্রাধান্য দিয়েছেন বলে তাঁর গল্প আসলে গল্প-শৃঙ্খলের একটি অংশ। পরশুরাম এই আসরকে প্রাধান্য দেননি কিন্তু তার মর্যাদা দিয়েছেন।' (বাংলা ছোটগল্প : পৃ ১৬৯, দে'জ ২০০২)

অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পরশুরামের পাত্রপাত্রীদের 'unconscious humourist' হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। এই গল্পে লম্বকর্ণকে নিয়ে বংশলোচনবাবুর বিড়ম্বনার বর্ণনায় সেকথাটা আবার স্মরণে আসে। বলা হয়ে থাকে, 'Humour may be ascribed either to a comic utterance or to a comic appearence or mode of behavior?' এখানে 'Comic utterence' র পাশাপাশি 'comic appearence' ও অপূর্বভাবে ধরা পড়ে। বেলেঘাটার খালের ধারে বেড়ানোর সময় যখন একটি ছাগল তাঁর সমস্ত চুরুট খেয়ে বলে 'অ-র-র-র' অর্থাৎ 'আর আছে?' তখন বিভ্রান্ত-হতবাক বংশলোচনবাবু। তার চামড়ার সিগার কেস ভক্ষণ করার পর—'রায়বাহাদুর হাসিবেন কি রাগিবেন স্থির করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন—শ'-শালা'। বর্মা চুরুট খাওয়ার পর লম্বকর্ণ বংশলোচনবাবুর বারান্দায় শুয়ে রোমন্থন করছিল। ঘুম তার চটে গেছে। এরমধ্যে রাত্রি একটা নাগাদ জোর ঠাণ্ডা হাওয়া উঠলে সে বংশলোচনবাবুর বিছানায় আশ্রয় নেয়। ক্ষিদের চোটে সে খবরের কাগজ ও গীতার তিনটি অধ্যায় উদারস্থ করেছে—গলা শুকিয়ে গেলে জলাভাবে প্রদীপের তেল পান করলে প্রদীপ নিভে গেল। নিষ্প্রদীপ ঘরে বংশলোচনবাবু তার বিছানায় মানিনীদেবীর মানভঞ্জনহেতু আগমন কল্পনায় লম্বকর্ণকে জড়িয়ে ধরলেন। ঘটে গেল ভয়ানক কাণ্ড। পাঠকের হাসির প্রাবল্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে বংশলোচনের বিড়ম্বনা।

এরকমভাবেই লাটুবাবুকে 'লব্বইটাকার লোট' ফেরৎ পেতে জোলাপ খেতে পরামর্শ দেন তিনি। এই Serious পরামর্শই 'হিউমার‍্যাস'। গল্পের পরিণতিতে আমরা দেখি বংশলোচনবাবুর বিড়ম্বনা চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে। এখানে বর্ণনাভঙ্গির মধ্যেই একটা

টেনশন তৈরী হয়। সিলোনে মনসুন আগমনের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছিলেন লেখক। এখন 'ড্রুম-দুদ্দুড়-দুড়ু! আকাশে কে ঢেড়রা পিটিতেছে? ...আসন্ন দুর্যোগের ভয়ে স্থাবর জঙ্গম হতভম্ব হইয়া গিয়াছে।' বংশলোচনবাবু বেলেঘাটার খালের ধারে যেখানে লম্বকর্ণকে পেয়েছিলেন সেখানে ছেড়ে দিলেন এবং ছাগলের গলায় লিখলেন—

'আল্লাকালী যীশুর দিব্য ইহাকে কেহ মারিবেন না'।

প্রাণে না মারার এই অহিংস প্রেমবাণী বারবার বাঁচিয়ে দেয় লম্বকর্ণকে। আসলে গল্পের এই পর্যায়ে লম্বকর্ণ আর শুধু ছাগল নয়—মানুষের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আরেকটি মনুষ্যেতর প্রাণী।

বংশলোচন ব্যানার্জ্জীর অসহায়ত্ব এই গল্পে লম্বকর্ণের কার্যকলাপের সমান্তরালে ফুটে উঠেছে। বৈঠকখানার আড্ডায় টেঁপি যখন স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য কলহের কথা শিশুসুলভ চপলতায় প্রকাশ করে দেয় তখন তাঁর বিনোদবাবু বলেন 'হে রায়বাহাদুর, কন্যাকে বেশি ঘাঁটিও না, অনেক কথা ফাঁস করে দেবে। অবস্থাটা সঙ্গিন হয়েছে বল?' লম্বকর্ণকে 'ঘরভেদী বিভীষণ' বলেন তিনি। আসলে রায়বাহাদুরের পারিবারিক অবস্থার বর্ণনাগুলি প্রচ্ছন্নে একটা ব্যঙ্গও তৈরী করে। যে লোক ম্যাজিস্ট্রেট, ইংরেজ সাহেবের আশীর্বাদপুষ্ট আমলা তিনিও কেমন নিজের পরিবেশ পরিস্থিতিকে করে তোলেন হাস্যাস্পদ-ব্যঙ্গাত্মক। মনে পড়ে 'চিকিৎসা সংকট' গল্পের নন্দবাবু নিজের অন্তিম সিদ্ধান্তে গল্পের মধুর পরিণতি ঘটে। বৈঠকী আড্ডাব পরিবেশ এই গল্পতেও সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। 'সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডে'র গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়ার পুণ্যের 'কমিশন' সঞ্চয়, তিনকড়িবাবুকে প্রতারণার অভিনব প্রকল্প সমস্তই রাজশেখর বসুব চরিত্রসৃষ্টির অভিনব প্রয়াস। এগল্পেও লম্বকর্ণ ও বংশলোচনবাবু, বিনোদ, লাটুবাবু, মানিনী দেবী, টেঁপি উদয় সকলেই অপরূপ অবয়ব নিয়ে ফুটে ওঠে। তাদের আচরণ, উৎকেন্দ্রিকতা, বিড়ম্বনা, সিরিয়াসনেস সমস্তটাই হাস্যরসের আধার।

'গড্ডলিকা'র অভিনব ছবিগুলির স্রষ্টা যতীন্দ্রকুমার সেন। দ্বারভাঙ্গার এই ভদ্রলোকের সাথে বেঙ্গল কেমিক্যালে চাকরির সময় ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। তিনি ছিলেন বেঙ্গল কেমিক্যালের বিজ্ঞাপন বিভাগের চাকুরে। 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী', 'হনুমানের স্বপ্ন'র সমস্ত স্কেচই তাঁর করা। এগুলো বাদ দিলে গল্পের হাস্যরস বা সৃষ্টি সামগ্রিক রস পাওয়া যাবে না। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ছবিগুলির ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছিলেন—'লেখার ধারা, রেখার ধারা সমানতালে চলে, কেউ কাহার চেয়ে খাটো নহে।' (প্রবাসী ১৩৩২) শ্রীসেন 'মানসী'তে 'মর্মবাণী'তে কার্টুন আঁকতেন ও ছড়া লিখতেন। লম্বকর্ণ' গল্পে মোট পাঁচটি ছবি আছে। 'দিব্বি পুরুষ্টু পাঁঠা', 'হজৌর', 'ভুটে বললে-হালুম', 'মরছি টাকার শোকে', 'লুচি কখানি খেতেই হবে' নামাঙ্কিত ছবিগুলি গল্পের রস ঘনীভূত করেছে।..বিশেষত দ্বিতীয় ও চতুর্থ ছবিতে চুকন্দর সিং ও লাটুবাবুর যে অদ্ভুত রূপায়ণ দেখা যায় তা বর্ণনায় সবটা পাওয়া যাবে না। বর্ণনার পরিপূরক হয়েছে ছবিগুলো। গল্পের প্রারম্ভে ছাগলের মুখাঙ্কিত রেখাচিত্র ও বংশলোচনবাবুর খালের ধারে লম্বকর্ণকে নিয়ে বসে থাকার চিত্রটিও অনবদ্য।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালপর্ব বাংলা ছোটগল্পে বিচিত্র বিভঙ্গে ধরা পড়েছিল। মানুষ ও সমাজ সর্বাত্মক বিকৃতি-অস্থিরতা-গ্লানির মধ্যে জেগে উঠছিল নতুন মানুষ, নতুন বাস্তবতা।

বাংলা ছোটগল্পে এই বস্তুতান্ত্রিকতা থেকেই আবির্ভূত হয়েছিলেন পরশুরাম। ফলতঃ রবীন্দ্রপূর্ব গল্পের বৈঠকীধারার সাথে চরিত্রের সামাজিকীকরণের এক অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। এরকম একটি হাসির গল্পেও দেখি প্রত্যেক চরিত্র এমনকি ঘর-আসবাব-পরিস্থিতি চিত্রণে সমকালীন বাস্তবতার বোধ সূক্ষ্মভাবে জারিত করে তাঁকে। ফলে নিতান্ত হাস্যরসের উৎসারণে সমাজের প্রেক্ষিতটি কখনই হারিয়ে যায় না। লম্বকর্ণের মত ছাগলকে বাড়িতে চিরকালের মত মানিনীদেবী যখন আশ্রয় দেন স্বামীর কল্যাণার্থে তখন ভাঙনের সময়েও বাঙালী পরিবারের চিরন্তন গৃহী মূল্যবোধ (Values) গুলি চারিয়ে ওঠে। এ মূল্যবোধের ভাঙনেই হাসি, কিন্তু রক্ষার কঠিনব্রতও কত বিচিত্র পথে উঠে আসে! পরিবারের কল্যাণকামিতার প্রতীক হয়ে ছাগল লম্বকর্ণের শিং কেমিক্যাল সোনায় বাঁধানো হয়। রাজশেখর বসুর গল্পে পরিপূর্ণতা এইখানে যে, তা মানুষ ও পরিবারের বন্ধনগুলির সম্পূর্ণতাকে তুলে ধরে। অনেক জায়গাতেই আধুনিকতার প্রগল্‌ভ প্রকাশকে তিনি ব্যঙ্গ করেন। একটা প্রচ্ছন্ন সমর্থন যেন থেকে যায় সনাতন জীবনচর্যার প্রতি। রসের সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর নির্দ্বন্দ্ব মতামত আছে 'লঘুগুরু' প্রবন্ধাবলীতে। তিনি বলেন—'কল্যাণের অন্তরায় না হয়ে, যাঁর সৃষ্টি স্থায়ী হবে, তিনিই শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা'। (পৃ ৫৩, ১৩৪৬) এখানে কল্যাণকামিতার পারিবারিক সনাতন ভিত্তিকেই গল্পেব সমাপ্তি হিসেবে ব্যবহাব করেন তিনি। এই কল্যাণময়তার নির্মাণে তিনি হাস্য ও ব্যঙ্গবসেব পৃথক নন্দন নির্মাণ করেন। 'লম্বকর্ণ' নামের Connotation-এ স্বামী-স্ত্রীব দাম্পত্য সম্পর্কের সেই অনুষঙ্গ ভেসে আসে।